OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 126 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 126 - 132
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর : বাঙালি জীবনের সংকট ও উত্তরণের প্রয়াস

ড. তারক পুরকাইত
Email ID : tarakpurkayet@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
World War II, famine, problem in Bengal, Manik's short story, crisis and way to descent.

Abstract
The crisis that World War II and the famine of the fifties created in Bengali life not only created a valley of death, but also heralded a far greater economic, social and moral decline. The death of people from starvation, half-starvation is actually the plague of our consciousness. Manik Banerjee shakes us with the roots of Chaitanya. He has expressed the crisis of Bengali life from various angles in his numerous short stories, and also tried to find a way out of the crisis.

Discussion

অদৃশ্য সময়ের স্রোতে নিরন্তর ভেসে চলেছি আমরা। অনন্ত সময়ের গতিপ্রকৃতি আঁচ করা সম্ভব নয় আমাদের মতো অসহায় মানুষের পক্ষে। সময় আমাদের সঙ্গে কখন কি যে খেলায় মেতে ওঠে কে জানে? এক মুহূর্তেই মানুষের সুসময়ের মৃদুমন্দ হাওয়া পরিণত হয়ে যায় অসময়ের ঝোড়ো হাওয়ায়। অপমৃত্যু ঘটে জীবনের সুন্দর স্বপ্নগুলির। আমাদের বেঁচে থাকা, না থাকা এক প্রবল প্রশ্নচিহ্নের উপকূলে এসে থমকে দাঁড়ায়। জীবনের গতি হয় রুদ্ধ। এক দমবন্ধ পরিবেশে অভিযোজন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠি। 'আলোর পদযাত্রী' হতে চাই, কিন্তু পথ এসে মেশে অন্ধকার সময়বৃত্তের গোলকধাঁধায়। 'তিমির বিলাসী' নই 'তিমির বিনাশী' ভাবনায় মনের সঙ্গে যতই না সন্ধি করার চেষ্টা করি দু:সময়ের কালসন্ধ্যা এসে জানান দেয় 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। সেই অস্থির সময়ের ক্যানভাসে ফুটে ওঠে সাধারণ মানুষের স্বেদ রক্ত ক্লেদাক্তময় জীবনের বীভৎস ছবি।

আমি যে অস্থির সময়ের কথা বলতে চাইছি তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর, যা আমাদের বিশ্বাসের মূলে প্রবল কুঠারাঘাত করেছে। অবশ্য কুড়ি বছর পূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের চৈতন্যের মর্মমূলে প্রথম আঘাত হেনেছিল। আমাদের মনে জন্ম দিয়েছিল অবিশ্বাসের বিষ। জীবন সুন্দরের পসরা দিয়ে সাজানো নয়, সুন্দরের পোশাক গেছে খুলে। বেরিয়ে পরেছে তার কঙ্কালসার কুৎসিত দিক। কল্লোলের সাহিত্যিকরা আমাদের পচাগলা সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের লোভ লালসা রিরংসার বেআব্রু দিক প্রকাশ করেছেন তাঁদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন –

> "কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[১]

'Belated kallolian', 'কল্লোলের কুলবর্ধন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অস্থির সময়ের পারে দাঁড়িয়ে সমকালীন যে জীবনকে দেখেছেন তা যেন 'ফরিঙের' 'দোয়েলের' জীবন। বড় অনিকেত সে জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন মনুষ্য সৃষ্ট, তেমনই পঞ্চাশের মন্বন্তর যত না ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল একশ্রেণির স্বার্থপর মুনাফালোভী মানুষের কুকর্মের ফল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর অজস্র ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের জীবনকে নানা কৌণিক আলোৎক্ষেপণে তুলে ধরেছেন। সেখানে আছে নিরন্ন মানুষের অসহায়তা, আছে অসামাজিক কাজের অদৃশ্য হাতছানি, আছে লোভ লালসা সম্পর্কের ভাঙন - সব মিলিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের করুণ সংকটের ছবি। অবশ্য তার বেশ কিছু গল্পে সংকট মুক্তির আভাসও লক্ষ্য করা গেছে।

মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান নিঃসন্দেহে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়কালে মানুষ এই ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটাতে অক্ষম ছিল। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য-দ্রব্যাদি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের আবহে মানুষ সামান্য খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করতে অপারগ ছিল। একশ্রেণির মুলাফালোভী বেসাতি মানুষ খাদ্যশস্য গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্মূল্য করে তুলেছিল। পর পর ফসলের অজন্মার কারণে গ্রামের মানুষ অসহনীয়ভাবে দিন কাটাচ্ছিল। অধিকাংশ গ্রামের মানুষ পালিয়ে এসেছিল তিলোত্তমা নগরী কলকাতায়। ফুটপাতে খোলা আকাশের নিচে অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় দিন কাটাতে কাটাতে তারা ঢলে পড়ছিল মৃত্যুর কোলে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে অন্নসংকটে মারা গিয়েছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ। যা নিঃসন্দেহে মানবতার লজ্জা।

মার্ক্সবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব এবং বাস্তবের রসসিঞ্চনে গড়ে উঠেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বীক্ষণ। এ কারণে প্রান্তিক কৃষক, মজুর, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর সরাসরি আঘাত করেছিল এইসমস্ত অসহায় মানুষের জীবনকে। সংকেত ভবন থেকে এপ্রিল-মে (বৈশাখ, ১৩৫৩) মাসে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ষোলটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'আজ কাল পরশুর গল্প' প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর' (বৈশাখ, ১৩৫৩) ছোটগল্প সংকলনের গল্পগুলিতে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি সহজেই পরিলক্ষিত।

> "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজার, দুর্নীতি প্রভৃতির পটভূমিকায় যে চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল এবং তার থেকে বাঁচবার যে নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছিল তারই পটভূমিকায় গল্পগুলো লেখা।"[২]

'আজ কাল পরশুর গল্পে' রামপদর বউ মুক্তা, যাকে গ্রামের নারী পুরুষ মিলে শহরের নিষিদ্ধ পল্লি থেকে উদ্ধার করে আনে - সে তার স্বামী রামপদর নিকট তার বিগত সময়ের দুর্দশাময় জীবনের কথা ব্যক্ত করেছে। এভাবেই ফ্ল্যাশব্যাকে গল্পের মূল বিষয়ের অনেকটা অংশ বিবৃত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বিপন্ন নিজের স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণে ব্যর্থ হয়ে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা নিয়ে প্রবাসী হতে হয় রামপদকে। এদিকে সাতমাসের সন্তান নিয়ে দিশেহারা মুক্তা সন্তানের মুখে খাদ্যাদি তুলে দিতে অসমর্থ হওয়ায় খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে তার সন্তান মারা যায়। মুক্তা তার স্বামীকে জানায় –

> "খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, একফোঁটা নেই। চাল গুড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।"[৩]

মুক্তার একাকিত্ব ও অন্নহীনতার সুযোগ নিয়ে নারী লোলুপ গ্রামের অর্থবান ঘনশ্যাম দাস মুক্তাকে প্রলোভিত করে রক্ষিতা হয়ে থাকতে। অন্যদিকে গ্রামের দুই মরদ রাতে তার কাছে এসে বলাৎকার করার চেষ্টা করে। মুক্তা তাদের কামড়ে দিয়ে কোনোক্রমে পালাতে সক্ষম হয়। পরিশেষে সে সদরে পালিয়ে যায়। তার স্থান হয় শহরের নিষিদ্ধ পল্লিতে। মুক্তার জবানীতে ধরা পড়েছে নারী জীবনের বিড়ম্বনার কথা –

> "দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 126 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মুক্তার মতো অগণিত অসহায় নারীরা এভাবেই পণ্যে পরিণত হয়। তারপর অন্ধকার নারকীয় জীবনে প্রবেশ করে সুস্থ সুন্দর জীবনের আশা পরিত্যাগ করে পঙ্কিলতায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু গল্পে খাদ্যদ্রব্যের সংকট ও সাধারণ মানুষের দুর্দশার দিক সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তেরশ পঞ্চাশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স কর্তৃক পরিমল গোস্বামীর সম্পাদনায় ২রা মার্চ ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় 'মহা-মন্বন্তর' নামে গল্প সংকলন গ্রন্থ। এই গল্প সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যদিও গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ভৈরব' পত্রিকায় শারদীয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে। ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া নিরন্ন অসহায় শীর্ণ জীর্ণ মানুষের মৃত্যু দর্শন তরুণ চাকরিজীবি মৃত্যুঞ্জয়ের দেহমনে চরম আঘাত করেছিল। না খেতে পেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে সে ভাবনার গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে দিশেহারা হয় তার মন। নিজের চাকরির মাস মাইনের সমস্ত টাকা রিলিফ ফান্ডে দান করে। অফিস যাওয়া ত্যাগ করে ফুটপাতে ঘুরে বেড়ায় সে। এভাবেই একদিন আদর্শবাদের কল্পনাতাপস মৃত্যুঞ্জয় পাগলে পরিণত হয়। 'পরিস্থিতি' গল্প সংকলন গ্রন্থের 'সারে সাত সের চাল' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যার করাল গ্রাসে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়া গ্রামের নিদারুণ শূন্যতার বাস্তবনিষ্ঠ ছবি ধরা পড়েছে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর গ্রাম্য মানুষগুলো দু-মুঠো অন্নের প্রত্যাশায় গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে ফুটপাতের বাসিন্দা হয়েছিল। সন্ন্যাসী জানে না তার ফেলে আসা গ্রামে তার নিজের পরিবার পরিজন কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। সন্ন্যাসী বহুদূর থেকে বহু কষ্টে সারে সাত সের চাল সংগ্রহ করে ফিরে আসছেন তার পরিবার প্রিয়জনের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার আশা নিয়ে। ফিরে আসার দীর্ঘ পথ পরিক্রমাকালে এক অজানা আশঙ্কা তার মনে উদয় হয় - সত্যিই তারা বেঁচে আছে তো? বেঁচে থাকলে কতজনই বা রয়েছে? আশা-আশঙ্কায় সময় যেন থমকে গেছে। দ্রুত পথ হাঁটতে থাকেন সন্ন্যাসী। সারে সাত সের চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝ রাতে দিতে পারলে হয়তো কেউ কেউ মৃত্যুর সঙ্গে আরও কিছু দিন লড়াই করতে পারবে। বাড়িতে পৌঁছে সন্ন্যাসী তার প্রিয়জনের নাম ধরে একে একে ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর আসে না। দরজার দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী লক্ষ্য করেন বাড়ির দরজা তালা দেওয়া। সন্ন্যাসী বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন-

> "দাওয়ায় সারে সাত সের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটা হদিস পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচে ছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বউঠান সুদ্ধ? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল?"[৫]

এরকম ভাবতে ভাবতে সন্ন্যাসী দাওয়া থেকে উঠোনে পড়ে মারা গেল। 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থের 'অমানুষিক' গল্পে ছিদাম চাষির ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার মর্মান্তিক করুণ কাহিল বর্ণিত। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের জটিল আবর্তে ছিদাম প্রথমে বাড়ির তৈজসপত্র, তারপর একে একে ঘরবাড়ি, চাষের জমি হারিয়ে কপর্দকহীন হয়ে পড়ে। জীবন বাঁচাতে ভিক্ষা পাত্র হাতে তুলে নেয়। লেখক জানিয়েছেন –

> "অনেক আশা নিয়ে মাসখানেক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছে ছিদাম। গেরস্ত চাষিই সে ছিল, ভিক্ষুক হবার আগে, এবার সে ভিক্ষা শুরু করেছে আবার গেরস্ত চাষি সেজে। গাবোকে কুঞ্জারই মতো গেরস্ত চাষির বউ সাজিয়ে সঙ্গে নিয়েছে কোলে মরোমরো বাচ্চাটাকে নিয়ে। ...তারপর বাচ্চাটা মরল। গাবো একদিন কোথায় গেল নীল প্যান্ট পরা লোকটার সঙ্গে ছিদাম জানতে চায় নি।"[৬]

'প্রাণের গুদাম' গল্পে সরকারি রেশনিং ব্যবস্থার ভালো খাদ্যপণ্য সাধারণ মানুষের কাছে না পৌঁছে তা চলে যায় কালোবাজারিদের গুদামে। তারপর বেশি দামে বিক্রি করে দেওয়া হয় কালো বাজারে। কন্ট্রোলের ভালো দ্রব্যের পরিবর্তে 'রদ্দিমাল' বরাদ্দ হয় সাধারণের জন্য। মানুষের নৈতিক অধঃপতন কতটা নিচে নামতে পারে তার নজির গল্পটি। 'লাজুকলতা' গল্প গ্রন্থের 'অসহযোগী' গল্পে আড়তদার হর্ষনাথ যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দিনে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি মজুত করে রাখে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায়। অন্যদিকে গ্রামের নিরন্ন মানুষের দল দুমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করতে থাকে। যদিও হর্ষনাথের পুত্র রমেন আড়ত থেকে হাজার হাজার মণ চাল বিলিয়ে দিয়েছিল বুভুক্ষু মানুষদের মধ্যে। 'খতিয়ান' গ্রন্থের 'ছিনিয়ে খায় নি কেন' গল্পে নিরন্ন মানুষগুলো "ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কুত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

লড়াই করে ময়লার ভুর হাতরেছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়নি"[৭] - তার কারণ উপলব্ধি করেছে যোগী ডাকাত।

'আজ কাল পরশুর গল্প' সংকলনের অন্তর্গত 'দুঃশাসনীয়' গল্পে বস্ত্রদ্রব্যের সংকটের নির্মম করুণ ছবি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশিত। কথায় আছে নারীর ভূষণই তার অলংকার। গল্পের শুরুতেই লেখক বস্ত্রহীনা গ্রাম্য রমণীদের প্রেতাত্মা ছায়ার সঙ্গে তুলনা করে তৎকালীন সময়ের দরিদ্র মা মেয়েদের অসহায় মর্মন্তুদ জীবন যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। লেখক জানিয়েছেন –

> "বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এই রকম কোনো ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কারবশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশ অপমৃত্যু - নিরুদ্ধার, এ-জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।"[৮]

গ্রাম্য মা, মাসি, বউ, মেয়েদের নগ্নতাকে সুন্দর ন্যারেটিভের মাধ্যমে প্রকাশ করে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার নগ্নতাকেই সকলের কাছে উন্মোচিত করে দেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে, কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, ... কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"[৯]

নির্বস্ত্র মা, বোন, বউ, মাসি-পিসিরা লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে দিনের বেলা অর্গলবদ্ধ হয়ে থাকে গৃহে। রাত্রি বেলা প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম সম্পন্ন করতে বের হয় বাড়ির বাইরে। নিশাচর হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

> "কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মা, মাসি, খুড়ি, পিসি, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি, বউ, ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে - এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয়। কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।"[১০]

নারীদের কাছে এভাবে জীবন অতিবাহিত করা ছিল কষ্টের, লজ্জার, অপমানের। গ্রামের মানুষ জানতে পারে তাদের জন্য কাপড়ের লড়ি আসছে। কিন্তু পুলিশি সহায়তায় সেই কাপড় গুদামজাত হয় কোনো আড়তদারের গুদামে। চাষির ঘরের মা, বউ, মেয়েরা দুর্ভিক্ষের দিনে শাকপাতা, খুদকুঁড়ো খেয়ে কোনোক্রমে নিজেকে বাঁচতে সক্ষম হলেও, উলঙ্গিনী হয়ে অপমানের জীবন মেনে নিতে পারছিল না। রাবেয়া তার স্বামির কাছে আবদার করেও যখন কাপড় পায় না তখন গলায় কলসি নিয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বস্ত্র সংকটের চিত্র রয়েছে 'রাঘব মালাকার' গল্পে। গল্পের সূচনায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে লেখক লিখেছেন –

> "পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপীনিদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন- বহুকাল পরে আবার তিনি অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখেছেন, তা তিনিই জানেন... তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকার, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও-"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 126 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাপড়ের অভাবে গ্রাম বাংলার অসংখ্য মা বোনেরা যখন উলঙ্গিনী অবস্থায় দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছিল, তখন রাঘব মালাকার চোরা-কারবারীর কাপড়ের গাঁট মাথায় করে ভিন্ন গ্রামে পৌঁছে দিত। একদিন সে গ্রামের লোকের সাহায্য নিয়ে কাপড়ের গাঁট লুঠ করে জেলে যায়। তার প্রচেষ্টায় তাদের গ্রামের মা বোনেরা লজ্জা নিবারণের উপায় তো খুঁজে পেয়েছিল!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্ত্রশিল্পের সংকটের চিত্র অঙ্কন করেছেন 'শিল্পী' গল্পেও। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সীমান্ত' পত্রিকায় ১৩৫২-১৩৫৩ সালে। পরবর্তী কালে গল্পটি 'পরিস্থিতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। একটা সময় বাংলাদেশের হস্ত চালিত তাঁত শিল্পজাত রেশমসূতির সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বস্ত্র জগদ্বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের মিলে তৈরি বস্ত্র এবং আমেদাবাদি সস্তা সুতোয় বাজার ভরে যায়। অন্যদিকে হাতে-কাটা সুতোর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এই অব্যবস্থার সুযোগে সুতোর কারবার হস্তগত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে মহাজনের দল। তারা বাজার থেকে সুতো কিনে তা গুদামজাত করে সুতোর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। সুতোর অভাবে তাঁতিদের তাঁত বন্ধ, ঘরে ঘরে উপোস। মহাজন চায় তার নির্ধারিত মজুরির বিনিময়ে তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় তৈরি করুক তাঁতিরা। এর ফলে তাঁতিদের 'পড়তা' কমে যাবে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে নিজেদের তাঁত বন্ধক বা বিক্রি করতে বাধ্য হবে। তখন মহাজনদের শোষণের হাতিয়ার স্বরূপ ভুবনের মতো দালালরা তাঁতগুলো কিনে নেবে। মহাজনরা বিবেকহীন দালালদের মাধ্যমে তাঁতিদের 'দাদন' প্রদানের দ্বারা প্রকারান্তরে সকলকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায়। মহাজনের দালাল ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের প্ররোচিত করতে থাকে কম মজুরিতে মহাজনের দেওয়া নিকৃষ্ট মানের সুতোয় গামছা বুনে দিতে। বৃন্দাবনের মতো অনেকেই ভুবন ঘোষালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পী মদন তাঁতি সারারাত খালি তাঁত চালিয়েছে তবু মহাজনি ব্যবস্থা মেনে নিয়ে নিকৃষ্টমানের সুতোয় গামছা বোনেনি। সূর্য যেমন পশ্চিমে উদিত হয় না, তেমনি 'মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে'। 'খতিয়ান' গ্রন্থের 'কানাই তাঁতি' গল্পেও বস্ত্রবয়ন শিল্পের সংকট ও তাঁতিদের দুর্দশার দিকটি সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশিত।

'নমুনা' গল্পে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের দুটি দিক প্রকাশিত - একদিকে জাল ওষুধের দ্বারা মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে মুনাফা লাভের প্রসঙ্গ, অন্যদিকে নারী কেনা-বেচার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ঘৃণ্য দিক প্রকাশিত। গল্পে দেখি যুদ্ধের বাজারে ময়দার আঠাকে কুইনিন নামে বিক্রি করা হয়েছে এবং তা সেবন করে কেশবের এক পুত্র ও এক কন্যার মৃত্যু হয়। বেঁচে রইল কেশবের বয়স্থা কন্যা শৈল। ধর্মভীরু কেশব লোভের বশবর্তী হয়ে মেয়েকে তুলে দেয় নারী ব্যবসায়ী কালাচাঁদের হাতে। কালাচাঁদ শৈলর সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রীর মতো একসাথে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সেও অর্থের লোভে শৈলকে বাড়িউলী মন্দোদরীর কাছে বিক্রি করে। মন্দোদরী শৈলকে তুলে দেবে নারী-দেহলোভী গজেনের জিম্মায়। কারণ – "(গজেনের) খেয়াল চেপেছে, ও আর বেশি টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।" বস্তুত পণ্যে পরিণত হওয়া নারীর দল শৈলর মতো একপুরুষ থেকে অন্য পুরুষের লালসার শিকার হয়েছে। আর তাদের বিক্রি করে লাভের বেসাতি করে কেশব, কালাচাঁদ, মন্দোদরীরা। এখানে সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই। গল্পটি প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "কামার্ত পুরুষ গজেন ও তার সরবরাহকারী কালাচাঁদ-মন্দোদরী ও সেই ধর্মভীরু লোভী কেশব - সকলের মধ্যে যে বিষ প্রবাহিত হয়েছে, তাতে সমাজদেহের পচন শুরু হয়েছে, এই মর্মান্তিক ব্যঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।"[১২]

'কংক্রিট' গল্পে যুদ্ধের বাজারে সিমেন্ট কারখানায় সিমেন্টে ভেজাল মিশিয়ে অবৈধ ভাবে মুনাফা লাভের দিক প্রকাশিত। যুদ্ধের ভয়াবহতা, মৃত্যুভয় মানুষের মনে কীরূপ প্যানিক সৃষ্টি করেছিল তার জলন্ত দৃষ্টান্ত 'প্যানিক' গল্পটি। যুদ্ধের আবহে কলকাতায় বোমা পড়ার আশঙ্কায় অনেকে বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করে। এরকম এক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা কথা দাবদাহের মতো ছড়িয়ে পড়ে যে সমস্ত যুবসম্প্রদায়কে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর প্রাক্ কালে জীবনকে উপভোগ করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে তারা। ধনেশের ছেলে পুলক মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। পিতার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সে জানায় –

> "... কেন খাব না? কদিন বাঁচব আর, তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে, কি, দুদিন বাদে সব ফুরিয়ে যাবে, আয় একটু ফূর্তি করি নি।"[১৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 126 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময়কালকে দেখেছেন অনুবিক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে। তাই সামাজিক অবক্ষয় ও মানুষের নৈতিক অধঃপতনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক তিনি অনায়াস লব্ধতায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন –

> "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেবার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)।"[১৪]

অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে কমিউনিস্ট ভাবধারায় পুষ্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রান্তিক মানুষের দুর্দশার চিত্রই কেবল অঙ্কন করেন নি, তৎকালীন সময়ে মানুষের সংকট মুক্তির পথেরও সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। 'আজ কাল পরশুর গল্প' এ মুক্তা শহরের নিষিদ্ধ পল্লি থেকে গ্রামে ফিরে আসার পর গ্রামে তার পুনর্বাসনের প্রশ্নে বিরূদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয় গ্রামের তথাকথিত মাথাদের কাছ থেকে। কিন্তু গ্রামের বলমালী-করালী-কানাই মুক্তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঘনশ্যাম দাস-টেকো নন্দীকে মুখের উপর জবাব দেয়।

> "মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি কিছু বউ-ঝিয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে তা বলে সেই বউ-ঝিরা এঁটো-কাঁটার মতো পরিত্যক্ত হতে পারে না। তাদের নিয়েই আবার নতুন করে সংসার গড়ে উঠবে। নতুন আশায় ভাঙা চোরা মানুষগুলো আবার বুক বাঁধবে। দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে হতবল মানুষ আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠছে...।"[১৫]

'রাঘব মালাকার' গল্পে রাঘব মালাকার মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মতো দুঃশাসনের বস্ত্রহরণের প্রতিবিধানে অগণিত দৌপদীর লজ্জা নিবারণে অগ্রসর ভূমিকা গ্রহণ পালন করে বস্ত্রের চোরাকারবারির মাল লুণ্ঠন করে জেলে যায়। এও তো এক প্রকার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। ধনবানেরা কখনো দরিদ্র নিরন্ন অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তাই তাদের সম্পদ লুট করা ছাড়া উপায় কি! 'অসহযোগী' গল্পে আড়তদার পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে রমেন হাজার মণ চাল বিলিয়ে দিয়েছিল বুভুক্ষু মানুষদের। বস্তা বস্তা চাল গুদামজাত করে বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা লাভের যে পথ, তা কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এ পথ লুঠের পথ, এ পথ সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই পিতার বিপরীত কাজ করে রমেন মানবতার নিশান উড়িয়ে দিয়েছিল। 'কংক্রিট' গল্পে কারখানার মালিক পক্ষের অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। 'ছিনিয়ে খায় নি কেন' গল্পে যোগী ডাকাত ধনীদের, আড়তদারের সঞ্চিত খাদ্যপণ্য লুঠ করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। 'শিল্পী' গল্পের মদন তাঁতি মহাজনি ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে সারারাত খালি তাঁত চালিয়েছে, কিন্তু নিকৃষ্ট মানের গামছা বোনেনি। সে তার শিল্পী সত্ত্বার অস্ত্র দিয়ে শোষণ ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভাস্বর হয়ে তাঁতি পাড়ায় নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে ওঠে। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য অন্বেষণে আসা নিরন্ন মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে সর্বতোভাবে। কিন্তু সংঘশক্তির উজ্জীবন ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ না হলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত্য সম্ভব নয়। তাই এবিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের যে উপলব্ধি তা আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব একথা বলতেই পারি –

> "প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারও বুকে নালিশ নেই, কারও মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝে নি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।"[১৬]

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নৈরাশ্যের ভিতর থেকে আশার আলো খোঁজার চেষ্টা করেছেন। মানুষের দুঃখ, দুর্গতি, দুর্ভিক্ষ আর অপমৃত্যুর কথাই তিনি লিখলেন না; সেই সঙ্গে আশার কথা, বিশ্বাসের কথা, জয়ের কথাও লিখলেন। কারণ যদি মনে সাহস থাকে, নিজের উপর বিশ্বাস থাকে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তি থাকে,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 126 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাহলে কখনোই মানুষ হারতে পারে না।[১৭] মানুষের জীবনে সংকট আসবে, সেই সঙ্গে সংকট মুক্তির পথের সন্ধান মানুষকেই করতে হয়।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ২৩
২. মিত্র, ড. সরোজমোহন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৮৭
৩. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৬৬
৪. ঐ, পৃ. ১৬৬
৫. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ২৬তম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৯০
৬. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ঐ, পৃ. ৩২৫
৭. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ঐ, পৃ. ১২৯
৮. ঐ, পৃ. ৯১
৯. ঐ, পৃ. ৯১
১০. ঐ, পৃ. ৯১ - ৯২
১১. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, পৃ. ২১৮
১২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ৫১৭
১৩. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ঐ, পৃ. ২৯৭
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, কেন লিখি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ঐ, পৃ. ১০
১৫. ড. সরোজমোহন মিত্র, ঐ, পৃ. ১৮৮
১৬. মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ঐ, পৃ. ৮৬
১৭. ঝা, উৎপল, আজ-কাল-পরশুর চিরন্তন গল্প, পশ্চিমবঙ্গ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি – এপ্রিল, ২০০৯, পৃ. ১১২